আবদুল্লাহ আল মামুন বিরচিত *কোকিলারা* পুরুষতান্ত্রিক "বাস্তবের গভীরে বাস্তব" নারীজীবনের পরাজয়

উম্মে সুমাইয়া*

সারসংক্ষেপ: এই প্রবন্ধে নিরীক্ষা করা হয়েছে বাংলাদেশের নাট্যজগতে এক পথিকৃৎ নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত ও নির্দেশিত মঞ্চসফল *কোকিলারা* নাটকে রূপায়িত সামাজিক শ্রেণি-নির্বিশেষে নারীর জীবন-বাস্তবতার স্বরূপ। এই নাটকের আঙ্গিকগত বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তুর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমাজের রূপরেখা অন্বেষণের মধ্য দিয়ে লক্ষ করা যায় যে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নারীকে নিপীড়নের যন্ত্র হিসেবে ভূমিকা রাখে। এই প্রতিকূল সামাজিক ব্যবস্থায় লিঙ্গীয় পরিচয়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ক্ষমতা-সম্পর্কের মধ্যে নারীরা পুরুষের অধস্তন হিসেবে হয় আত্মহত্যা করে, না হয় জীবনের তলানিতে পড়ে থাকে। এই প্রবন্ধে উন্মোচিত হয় যে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যে মিলিয়ে যায় এবং পরাজয়ই হয়ে ওঠে নারীর একমাত্র জীবন-বাস্তবতা।

বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত পরিচয় এবং নামকরণের সম্পর্ক

মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চর্চার সোনালী ফসল গ্রুপ থিয়েটার চর্চা। এই নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিভিন্ন নিরীক্ষা নিয়ে শক্তিশালী কয়েকজন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে। আবদুল্লাহ আল মামুন তেমনই এক শক্তিমান নাট্যকার। এই নাট্যকারের সৃষ্টিশক্তি বিবেচনা করতে সমসাময়িক আরেক গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকার ও সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক কবিতার ভাষায় রচনা করেন আবদুল্লাহ আল মামুনের জন্য প্রশস্তি :

> জেগে ওঠে বাস্তবের গভীরে বাস্তব
> আপনার দৃশ্যপটে- মানুষ দাঁড়ায়
> যেখানে মানুষ তার দু'হাত বাড়ায়,
> মানুষকে কাছে টানে, সত্য নেয় চিনে,

* প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> বুঝে নেয় জীবনের কোথায় শেকড়।
> জেগে ওঠে দর্শকেরা করাল দুর্দিনে,
>
> নাট্যজন, আপনারই শিল্পের ভেতর (হক, ২০০৮ : ৩৩)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির নৈতিক অবক্ষয় ও জাগ্রত শুভবোধের দ্বন্দ্ব উপজীব্য করে রচিত হয়েছে তাঁর অধিকাংশ নাটকের শিল্পভুবন। বিষয়বস্তুর সামাজিক তাৎপর্য ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের জন্য বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে যে নাটকটি, তার নাম *কোকিলারা*। বিষয়বস্তুর সূত্রে বলা যায়, এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে নারীর এক সম্পূর্ণ জীবন। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে শ্রেণি-নির্বিশেষে কেবল নারী পরিচয়ের অধিকারীদের নিদারুণ বাস্তবতা প্রতিফলিত হয় এই নাটকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন শোষণমূলক অনুশাসন ও বিধি-ব্যবস্থাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার ফলে নারীর জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তা-ই এই নাটকের মুখ্য বিষয়বস্তু। অন্যদিকে আঙ্গিকগত দিক থেকে এটি হলো "একক চরিত্রভিত্তিক নাটক", ইংরেজিতে যাকে monodrama বলা হয়। তিন পর্বের এই নাটকে প্রত্যেক পর্বের চরিত্রের নাম কোকিলা। এই দেশের পুরুষশাসিত সমাজে অন্তিম পরিণতির মাপাকাঠিতে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিটি কোকিলাই যেন অবশেষে হয়ে ওঠে একজনই কোকিলা। কোকিলাদের কোনো শ্রেণিপরিচয়গত স্বতন্ত্র তাৎপর্য নেই। বিত্ত নয়, পদমর্যাদা নয়, নারীত্বই তাদের আত্মপরিচয়ের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে ওঠে। একক নাটকের মঞ্চ-পরিবেশনা বিষয়ে গবেষক ফ্রানচেস্কা প্লাচানিকা বলেন, "Most often, […] monodrama reconnects with the aesthetics of loss, absence, and betrayal […]" (Placanica, 2018)। এই সূত্রে বলা যায়, এই নাটকের তিন কোকিলাকেই বরণ করতে হয় একই নিয়তি। তাদের প্রত্যেকেই জীবনে প্রতারিত হয়। এর ফলে তাদের প্রত্যেকের জীবনেই নেমে আসে বির্পযয়। একা নারীর প্রতিবাদী প্রয়াস পুরুষতন্ত্রের ব্যবস্থাগত প্রবল শক্তির কাছে পরাজিত হয়। তিনজন কোকিলার প্রত্যেকের জীবনেই নেমে আসে অভিন্ন করুণ পরিণতি। তাই আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত এই নাটকের যথার্থ নামকরণ *কোকিলারা*।

নারীজীবনের একক কাহিনির রূপরেখা

নাট্যজন রামেন্দু মজুমদারের অভিমত থেকে সমৃদ্ধ হয়ে বলা যায়, এক চরিত্রের নাটক নির্মাণে যে-কুশলতার প্রয়োজন, নাট্যকার তার সফল উদাহরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন এই নাটকে। তিন শ্রেণির তিনটি পৃথক পৃথক চরিত্রের, তিনটি অলাদা অলাদা পর্বে বিভক্ত, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কাহিনিকে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার একটি একক কাহিনিতে রূপায়িত

করেছেন। তিন পর্বের এই নাটকের কাহিনির কেন্দ্রীয় ঐক্যসূত্র হয়ে ওঠে নারীজীবনের এক ও অভিন্ন পরিণতি। প্রথম কোকিলা গ্রাম থেকে শহরে আসা এক সহজ-সরল নারী। সে বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করতে এসে এই পরিবারের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া নিকটাত্মীয়ের যৌনলালসার শিকার হয়। শিক্ষিত এই যুবক কর্তৃক বিয়ে করার মিথ্যা আশ্বাসে কোকিলা গর্ভে ধারণ করে "অবৈধ" সন্তান। এই পরিবারের গৃহকর্ত্রী, যাকে কোকিলা খালাম্মা বলে ডাকত, তার দ্বারা অভিযুক্ত হয় এবং চূড়ান্তভাবে নিগৃহীত হয়। শেষ পর্যন্ত কোথাও সুবিচার না পেয়ে নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র প্রথম কোকিলা গর্ভের সন্তানসহ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় কোকিলা মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখী গৃহিণী। স্বামীর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সে ধর্মপরায়ণ ও সরলমতি। কিন্তু পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষে, "বৈচিত্র্যসন্ধানী" স্বামী বিয়ে করে বসে তার অফিসের এক সহকর্মীকে। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে, অনেক অনুনয় করেও যখন তাঁর আপন ঘরে সে ঠাঁই পেল না, বরং শারীরিকভাবে নিগৃহীত হলো, তখন দ্বিতীয় কোকিলার জীবনেও নেমে আসে মৃত্যুর অন্ধকার। অন্যদিকে তৃতীয় কোকিলা একজন আইনজীবী। আগের দুই কোকিলার ঘাতকদের বিচারপ্রার্থী হয়ে আদালতের এজলাসে দাঁড়ায়। কিন্তু অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করতে ব্যর্থ হয় এই কোকিলা। আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে অপরাধীরা ঠিকই খালাস পেয়ে যায়। অতএব বাধ্য হয়ে কোকিলা বিচার চায় জনতার আদালতে। তাঁর বিশ্বাস–এই আদালত অবশ্যই দুই কোকিলার ঘাতকদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করতে সক্ষম হবে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টার গ্লানি নিয়ে তৃতীয় কোকিলার হতাশায় ভেঙে পড়ার মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকাপাত ঘটে (মজুমদার, ২০০৯ : অনুল্লেখকৃত)।

পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায় নারীর "নারী হয়ে ওঠা"

এই নাটকের কাহিনির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন এই দুই নারীর–প্রথম ও দ্বিতীয় কোকিলার– মধ্য দিয়ে পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর জীবনের পরিণতি নির্ধারণ করেন। কারণ এই নাটকে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় একটিমাত্র সত্য, আর তা হলো নারীর লাঞ্ছনার কোনো বিকল্প প্রতিকার নেই। লাঞ্ছিত ও ভাগ্যাহত নারীর জীবনে মুক্তির একমাত্র সমাধান হলো লজ্জায় ঘৃণায় মূল্যহীনতায় নিজেই নিজের জীবনের রাশ টেনে ধরা অর্থাৎ আত্মহত্যা। এই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল নাট্যকার চিত্রিত করেছেন তৃতীয় আরেক কোকিলাকে। উচ্চ শ্রেণির এই নারী রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থার সাথে জড়িত একজন আইনজীবী। তৃতীয় কোকিলা অপরঅপর দুই কোকিলার বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে আওয়াজ তুলে

প্রতিবাদ করে। কিন্তু তার প্রতিবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ সামাজিক পদসোপানে নারী যতই উন্নত পদমর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, কোকিলার সকল প্রতিবাদী প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয় কেবল সমাজে লৈঙ্গিকভাবে তার নারী-পরিচয়ের কারণে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার ও মর্যাদার সীমা নির্ধারিত ও নির্ণীত হয় পুরুষের দৃষ্টিতে। এমনকি যে সকল পুরুষ সামাজিক পরিসরে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিতকরণে সোচ্চার, তাঁরাও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অবচেতন মনে হলেও পুরুষ-প্রাধান্যের বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সম্মত থাকেন। এর কারণ হিসেবে পুরুষাধিপত্যের আওতাধীন সমাজব্যবস্থাকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন হুমায়ুন আজাদ পশ্চিমা নারীবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, "কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং হয়ে ওঠে নারী। সমাজে যে নারী দেখা যায়, কোন জৈব, মনস্তাত্ত্বিক বা আর্থনীতিক ভাগ্য তাঁর রূপ স্থির করে না; সমগ্র সভ্যতাই উৎপাদন করে পুরুষ ও খোজার মাঝামাঝি এ প্রাণীটিকে, যাকে বলা হয় নারী" (আজাদ, ২০০২ : ১৮২)।

ভাষা ও সংলাপ পর্যালোচনা : নারীর জবানবন্দিতে জীবন-বাস্তবতার স্বরূপ

ভাষা যেমন যোগাযোগ সৃষ্টি করে, তেমনই শ্রেণিবিন্যস্ত জীবন-বাস্তবতার স্বরূপও উন্মোচন করে। *কোকিলারা* নাটকে নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুনের সংলাপ রচনার নিপুণ কৌশলের মধ্যে এই ভাবনার যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

গৃহপরিচারিকা কোকিলা ভাবে একদিন এই ক্রীতদাসের জীবন পরিত্যাগ করে গার্মেন্টসের কাজে চলে যাবে। নিম্নবিত্ত কোকিলার ভাবসত্য প্রকাশের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থায় ব্যবসা ও শিল্পায়নভিত্তিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটা পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। এই সামাজিক রূপান্তরের মধ্যে একজন নিঃসম্বল নারীও তার জীবন রূপান্তরের সম্ভাবনা খুঁজছে। কিন্তু সে রূপান্তরের সম্ভাবনা খোঁজার মধ্যেও কোকিলা দ্বিধান্বিত। শেষ পর্যন্ত গৃহপরিচারিকার কাজ নিয়ে ভীরুতায় বন্দি হয়ে থাকে। অন্যদিকে নাট্যকার নিম্নবিত্ত মেজাজে উপস্থাপিত এক নারী কোকিলার সংলাপের মধ্যে পুরুষশাসিত সমাজে বেড়ে ওঠা নারীর পরাধীন দৃষ্টিভঙ্গিও তুলে ধরেন। প্রথম কোকিলা যখন নিজের মায়ের ভাবনা প্রকাশ করে, তখন তা লক্ষণীয় :

> এই বুইরার লগে বিয়া না বইলে, একজন পুরুষ না থাকলে এই রাক্ষসের দুনিয়ায় না আমি বাঁচতে পারুম না তরা বাঁচতে পারবি। খাবলা দিয়া তগ গতর থিকা গোশত উঠাইয়া লইব। পলানির জাগা পাইবি না। পুরুষ পোলা হইয়া জন্মাইতে পারলি না? ক্যান, ক্যান মাইয়া হইয়া জন্মাইলি? মাইয়া মানুষের একমাত্র ভরসা হইতাছে পুরুষ। পুরুষ ছাড়া মাইয়া মানুষ বাঁচে না। (মামুন, ২০০৯ : ২৮৬)।

এক নারীর মনস্তাত্ত্বিক গড়নের পাশাপাশি পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ছবি তুলে ধরেন নাট্যকার। পুরুষ ছাড়া নারী অচল। নারী অসহায়, ফলে পুরুষনির্ভর সমাজে নারীর নারী হয়ে বেঁচে থাকাই কোকিলাদের জীবন-বাস্তবতা। কোকিলার নতুন বাবা কোকিলাকে শারীরিকভাবে ভোগের চেষ্টার মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয় পুরুষশাসিত সমাজের এক কদর্য সত্য – নারী কেবলই তার শরীর দ্বারা বিচার্য হয়ে ওঠে। কারণ অন্ধকার ঘরে "পুরুষরা মাইয়া মানুষ ছাড়া বাঁচে না"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজ কীভাবে নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে, আর পুরুষকে দায়মুক্তি দেয়, তাও কোকিলার কণ্ঠস্বরে নিদারুণভাবে ফুটে ওঠে :

> আল্লার সেরা জীব মানুষেরে বিশ্বাস করা কি পাপ? এক পুরুষের বাচ্চা আমারে ধোঁকা দিয়া পার পাইয়া গেল। সোন্দর সমাজের মাইজখান দিয়া হাইট্টা গেল গা। অহনও হাটতাছে। আর আমি? আমি তার পাপের বোঝা টানতাছি। এইডা আপনাগো কুন বিচার? আইনের কুন কিতাবে লেখা আছে, আমিই দোষী? ব্যাবাক শাস্তি আমারেই পাইতে হইব? আমি আইন বুজি না। আপনেগো লগে তক্কও করতে পারুম না। আপনেরা লেহাপরা জানা, পরিষ্কার কাপর-চোপর পড়া ভদ্দর লোক। আপনেগো কাছে কোকিলার একটাই পরিচয়। কোকিলা চাকরানি। কোকিলা গেরামে থিকা টাউন আসছে প্যাটের জ্বালায়। কোকিলা নষ্ট মাইয়া। কোকিলা ভদ্দরলোকের পোলার ইজ্জত নষ্ট করছে। ভদ্দরলোকের ঐ পোলার কুনো দোষ নাই। কোকিলা ঢং ঢং কইরা তারে ভজাইছে। শিক্ষিত ভদ্দরলোক এত বোকা না যে চাকরানিরে বিয়া করতে চাইব। সব নষ্টের গোরা কোকিলা (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ২৯৬)।

দার্শনিক উপলব্ধির মাধ্যমে পুরুষশাসিত সমাজ-বাস্তবতার একটি বিশ্বজনীন স্বরূপ যেন উন্মোচিত হয় কোকিলার এই অন্তরদগ্ধ সংলাপে :

> এই দুনিয়াটা আল্লায় বানাইছে কেবল পুরুষগো লিগা। এইহানে মাইয়া মানুষের বাঁচনের পথ নাই। এই দুনিয়া পুরুষের বাচ্চার ফুর্তির জায়গা। দেশেও হেগো ফুর্তি। বিদেশেও। তাই আমি ঠিক করলাম, বাচুম না। এই দুনিয়ায় বাইচ্যা থাকলে আমার জিন্দেগিতে আরও পুরুষ আসব। আমারে বেশ্যা বানাইয়া ছাইরা দিব। তারথন ভালো মইরা খোদার কাছে গিয়া বিচার চাই (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩০০)।

কোকিলা প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু পুরুষের কৌশলের কাছে হেরে গেছে। পুরুষের চোখে নারী সব সময় তার সুবিধা দ্বারা বিবেচ্য, ফলে পুরুষ সব সময় চায় নারীকে আদিম অবস্থায় রেখে তার নারীত্বের স্বাদ নিতে। কোকিলা পুরুষশাসিত সমাজের হাতে, পুরুষের হাতে জীবন ছেড়ে না দিয়ে মৃত্যু বেছে নেয়। যে নারী তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার এবং টিকিয়ে রাখার সুযোগ পায়, সেই নারীকে দুই বিধাতার মধ্যে এক বিধাতার হাতে তার জীবন সমর্পণ করতেই হয়। কোকিলা পুরুষ বিধাতার কাছে সমর্পণ না করে অদৃশ্য বিধাতাকে বেছে নেয়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় কোকিলার সংলাপে দেখা যায় যেখানে নাট্যকার চরিত্রের কণ্ঠে নারীর অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরেন :

> নারী নির্যাতনের কি একটা খবর নাকি বেরিয়েছে আজকের কাগজে, সেটাই তিনি আমাকে বিশেষ করে পড়তে বললেন। নারী নির্যাতন- এই এক নতুন বিষয় নিয়ে ইদানীং নারীরা বড়ই বেচইন হয়ে পড়েছেন। দেশে নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের চেয়ে বেশি বলেই বোধহয় ভোট প্রার্থীরাও বিষয়টির যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে চলেছেন। কিন্তু নারী নির্যাতন চলছেই এবং আমার ধারণা এটা চলবেই। এই পুরুষ শাসিত সমাজে যতদিন পুরুষেরাই একচেটিয়াভাবে দয়া ধর্ম করে নারীকে বিয়ে করে বউ বানাতে থাকবে ততদিন এই ধারার পরিবর্তন হবে না। বহু কাঠ খড় পুড়িয়ে হয়তো বা নারীরা সবক্ষেত্রেই পুরুষকে টেক্কা মেরে দিলেন। কিন্তু সন্তান ধারণ? সন্তান লালন পালন? এক্ষেত্রে তো পুরুষ কেয়ামত পর্যন্ত বগল বাজিয়েই চলবে। পারবে নারীরা পুরুষদের সন্তান ধারণ করাতে? এ নিয়ে মজার মজার সব সিনেমা তৈরি হয়েছে বিদেশে। কিন্তু ঐ সিনেমা পর্যন্তই। সমস্যাটির সমাধান হয়নি, হতে পারে না (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩০৩-৩০৪)।

যে সমস্যার কথা নাট্যকার নারী-চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলাচ্ছেন, সেই সমস্যা যে সমাধানযোগ্য নয়, তা-ই বক্তব্য আকারে বলতে চান নাট্যকার। কারণ নাট্যকার নিজেই পুরুষশাসিত সমাজের আবরণে গড়ে ওঠা এক সত্ত্বা। তাঁর মতে, উপরোল্লিখিত এই সমস্যার সমাধান সমাজে নেই, বরং এটা চলমান প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকার এর নাম দিয়েছেন 'খাঁচা', যেখান থেকে নারীর মুক্তি নেই :

> এই সমাজ ঐ হতভাগিনীকে কি দিয়েছে? ধোঁকা। দু অক্ষরের অসভ্য একটা শব্দ। ধোঁকা। এই ধোঁকার সূত্র ধরে কোন এক বিশ্বাসঘাতক তাকে উপহার দিয়েছে অবৈধ সন্তান। আমি জানি, আপনারাও জানেন, সেই বিশ্বাসঘাতকটা অবশ্যই একটা পুরুষ, এবং পুরুষ বলেই সে যখন এই পুরুষ শাসিত সমাজে মাথা উঁচু করে হেঁটে বেড়াচ্ছে তখন এই হতভাগিনী পেটে অবৈধ সন্তান নিয়ে রেলের তলায় মাথা পেতে দিচ্ছে। এই পুরুষটি হয়তো আজীবন এমনি আরো অনেক মেয়েকে হতভাগিনী বানিয়ে রেলের চাকার তলায় ঠেলে দেবে। কোনোদিন তার বিচার হবে না। এই অপরাধের কোনো প্রতিবিধান নেই। সমাজ নামক খাঁচার মধ্যে আমরা সবাই বন্দি। এই বন্দিদশা থেকে পুরুষ হয়ত একদিন তার সুবিধামতন মুক্তি খুঁজে নেবে। কিন্তু নারীরা মুক্তি পাবে না (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩০৫)।

তবু প্রবঞ্চিত নারী এই পৃথিবীতে নিজের অধিকার ও অবস্থান নিয়ে এক ধরনের প্রশ্ন উপস্থাপন করে:

> আমি নীরব রইলাম। আমার দীর্ঘ পঁচিশ বছরের জমিন আমি এমনিতেই ছেড়ে দেব? স্ত্রীর অধিকার নিয়ে একটি বার দাঁড়াবো না স্বামীর সামনে? জানতে চাইব না কি আমার অপরাধ? চলে গেল মেয়েরা। আমি আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ঠায় বসে রইলাম।

অধিকার? পৃথিবীতে অধিকার বলে সত্যি কিছু আছে কি? অধিকার কে কাকে দেয়? (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩১৩)।

অন্যদিকে দ্বিতীয় কোকিলা নিজের মর্যাদা রক্ষার মরিয়া চেষ্টার কথা তুলে ধরে :

> আমার স্বামী আমাকে ডিভোর্স করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠোই ঐ কাগজগুলোকে মনে হল লক্ষ লক্ষ সাপ যেন ফণা তুলে সমানে আমাকে দংশন করে চলেছে। ওদের দংশনের জ্বালায় জর্জরিত হয়ে স্বামীর পা জড়িয়ে ধরলাম। ফিরিয়ে নাও, এ কাগজ তুমি ফিরিয়ে নাও। তোমার কাছে আমি বাকি জীবন কিছুই চাইব না শুধু স্ত্রীর মর্যাদাটুকু অক্ষুণ্ন রাখো। আমি তোমার বাড়ীর বারান্দায় কিংবা রান্নাঘরে পড়ে থাকব। একটুও বিরক্ত করব না, তোমাকেও না, তোমার নতুন বউকেও না। দয়া কর। আমাকে তোমার স্ত্রীর পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে দাও (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩১৬)।

দ্বিতীয় কোকিলা তার "স্বামী"র পরিচয়টুকু নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। এই চাওয়ার কারণে তার জীবনে নেমে আসে মৃত্যু। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের মুখোশ উন্মোচন করতে নাট্যকার তৃতীয় কোকিলাকে উপস্থিত করান আদালতে। নারীর ওপর সংঘটিত নির্যাতন ও অন্যায়ের প্রতিবাদে আরেক নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় কোকিলার মর্মান্তিক পরিণতির জন্য পুরুষতন্ত্রকে দায়ী করে আইনজীবী তৃতীয় কোকিলার বক্তব্য :

> পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষেরই মুখোশ উন্মোচিত হবে আজ। আদালতে উপস্থিত পুরুষেরা মাপ করবেন, মহামান্য আদালত আপনি সমেত, কেননা দেখতে পাচ্ছি আপনিও একজন পুরুষ, আপনারা সবাই যার যার পরিধেয় বস্ত্র সামনে রাখুন। কেননা যে কোনো মুহূর্তে আপনারা বিবস্ত্র হয়ে যেতে পারেন। কি হল? একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন? ভাবছেন এক কোকিলা এসেছে দুই কোকিলার কথা বলতে। কোকিলারা তো সবাই মেয়েছেলে। তারা আবার কথা বলতে শিখল কবে? এই প্রশ্নের উত্তরটাই তাহলে প্রথমে দিচ্ছি। কোকিলারা মায়ের জাত। সন্তানের মুখে সবার আগে কথা গুঁজে দেন যিনি তিনিই মা। আপনারা যার যার মায়ের মুখটা স্মরণ করুন। তাহলে আমিও আমার কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারব, আপনারাও আমার কথা শান্তিতে শুনতে পারবেন (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩১৮)।

আদালতে কথা বলার মাধ্যমে নাটকের তৃতীয় পর্বের একটা প্রতীকী তাৎপর্য সৃষ্টি হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দর্শকই যেন আদালতের কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান। আদালত যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই নির্মিত ভাবাদর্শ দিয়ে সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান, সেখানে সমাজকেই যেন আদালতের প্রতীকে মূর্ত হতে দেখা যায়। এখানে পুরুষ নাট্যকার অত্যন্ত ধারালোভাবে ও সংবেদনশীলতায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই প্রশ্নের মুখোমুখি করেন

আইনজীবী কোকিলার সংলাপের মাধ্যমে। তৃতীয় কোকিলা যখন প্রত্যক্ষভাবে এই সমাজকে "পুরুষশাসিত সমাজ" হিসেবে অভিহিত করে অভিযুক্ত করছে, তখন কোকিলা যেন নিজের কর্তাশক্তি (Agency of Subjectivity) আবিষ্কার করতে পারছে। একজন নারী হয়ে যে সমাজে সে বাস করছে, সেই সমাজ পুরুষশাসিত। অনুধাবন করা যায় যে লিঙ্গীয় বিভাজন দিয়ে এই সমাজে ক্ষমতার কাঠামো নির্মিত হয়। বিপরীত দিক থেকে তৃতীয় কোকিলার এই কর্তাশক্তিও সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে যখন "কোকিলারা মায়ের জাত" বলে নারীকে চিহ্নিত করছে। নারীর মনোজগতে এ ধরনের চিন্তা পুরুষতন্ত্রই প্রবিষ্ট করে। "মায়ের জাত" বলার মধ্য দিয়ে নারীর অস্তিত্বে পুরুষের জন্য সুবিধাজনক এক প্রকার মানবীয় কোমলতা আরোপ করা হয় পুরুষ কর্তৃক নারীকে শাসন-শোষণের সুবিধার্থে। এর ফলে নারীর বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশের ভাবধারা অবদমিত হয়।

ফলে "মায়ের জাত" সম্বোধন আসলে পুরুষতান্ত্রিক একটি অভিধা মাত্র, যার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের নিজের অজান্তেই তাঁর অবচেতন মনে সুপ্ত থাকা পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাটি বেরিয়ে পড়ে :

> "মহামান্য আদালত, আমি জানতে চাই, আল্লাহকে নিয়ে, তার ধর্মকে নিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের এই খেলা চলবে কতকাল? আনোয়ারের মতন আরো আনোয়ার আছে এই সংসারে, এই দেশে। আল্লা কি তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি? ধর্ম কি তাদের কাছে ছেলের হাতের মোয়া?" (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩২২)।

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত, আর সেই মায়ের বেহেশত তার স্বামীর পায়ের নিচে–নাট্যকারের এই ভাবনার মাধ্যমে সমাজে নারীর অধস্তন পরিস্থিতিকেই চিহ্নিত করা যায় :

> গ্রামের সহজ-সরল এক রমণীকে ক্রীতদাসী বানিয়ে এই সমাজ ক্ষান্ত হয়নি। তাঁকে বানিয়েছে কামুক পুরুষের ভোগের সামগ্রী। আই হেইট দিস সোসাইটি, আই হেইট। লেট আস অল হেইট দিস সোসাইটি। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আসুন আমরা সকলেই কিছু নগ্ন সত্যের মুখোমুখি হই (প্রাগুক্ত, ২০০৯ : ৩২১)।

এখানে লক্ষ করা যায় যে একজন মানুষ হিসেবে নারী যে তার কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে, নিজের জীবনের দায়িত্ব নিয়ে, নিজেই এই সমাজ, রাষ্ট্র ও পৃথিবীতে কর্তা হয়ে উঠতে পারে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সেই সম্ভাবনাটুকুও আত্মসাৎ করে। "লেট আস হেইট দিস সোসাইটি", অর্থাৎ চলুন আমরা সকলেই এই সমাজকে ঘৃণা করি – এই সংলাপের মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি শুধু ঘৃণা প্রকাশ পর্যন্ত সীমিত

থাকছে। এর মধ্যে সমাজকে নারী-পুরুষ সকলের সমানাধিকারচর্চার একটি অনুকূল ক্ষেত্রে রূপান্তরের কোনো বাসনা প্রকাশ পায় না। কোকিলার এই কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত নারীর চূড়ান্ত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে অক্ষম। যদিও এমন চূড়ান্ত বিদ্রোহের প্রকাশ লক্ষ করা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে নরওয়েজীয় নাট্যকার হেনরিক ইবসেন রচিত *এ ডল'স হাউস* নাটকে, যেখানে নোরা নামের এক নারী স্বামী-সন্তান পশ্চাতে রেখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তায় আলোড়িত হয়ে, পুরুষশাসিত ঘর ছেড়ে বাইরে অর্থাৎ মানুষের কোলাহলমুখর এক বিরাট পৃথিবীতে পা বাড়াতে সক্ষম হয়।[১]

উপসংহার

প্রথম ও দ্বিতীয় কোকিলার আত্মহননের ঘটনা এবং দুই কোকিলার আত্মহত্যা যে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার চাপে পড়ে সংঘটিত হয়েছে, সেই নৈতিক ও যৌক্তিক অবস্থান থেকে তৃতীয় কোকিলার প্রতিবাদও যখন ব্যর্থ হয়, তখন এই নাটকে চিত্রিত নারীর জীবন-বাস্তবতার গভীরতলে দুটো বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সৈয়দ জামিল আহমেদের বক্তব্য অনুযায়ী নারীর ক্ষমতাহীনতা। কোকিলাদের পরিণতি সম্পর্কে আরেকজন গবেষকের উদ্ধৃতি সহকারে জামিল আহমেদ বলেন, "[…] the three Kokilas […] are set up to demonstrate how […] 'the institutions of marriage and divorce disempower women irrespective of classes' […]" (Ahmed, 2014, 161)। 'বিবাহ' ও 'তালাক' নামক দুটো সামাজিক প্রতিষ্ঠান, একজন নারী যে শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, তাকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাহীন করে। দ্বিতীয়ত, শাহমান মৈশানের বক্তব্য অনুযায়ী আধা পুঁজিবাদী সমাজে পুরুষাধিপত্যের কারণে নারীর ক্ষমতাহীন হয়ে পড়া। কোকিলার মতো নারীদের এই ক্ষমতাহীনতা পুরুষের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার সাপেক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব। বাংলাদেশের নাট্য ও পরিবেশনা সংস্কৃতিতে নারী ও পুরুষের এই ক্ষমতা-সম্পর্কের স্বরূপ প্রসঙ্গে শাহমান মৈশান বলেন, "[…] the rivalry of feudalist/proto-capitalist patriarchal power struggles for supremacy over the feminine power. Thus, the conflict between the two forces of patriarchy and the feminine entity works […]" (Moishan, 2012, 70)। অনুরূপভাবে দুই কোকিলারা বিরুদ্ধে সংঘটিত পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতান্ত্রিক শক্তির নিপীড়নের প্রতিবাদে স্পষ্টতই তৃতীয় কোকিলা মুখোমুখি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই নাটকে অবধারিতভাবেই সামন্ততান্ত্রিক বা আধা পুঁজিবাদী পুরুষশাসিত সমাজ নারীর কর্তাশক্তির বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থাগত শত্রুতায় লিপ্ত হয়। নারীর

কর্তাশক্তি শেষ পর্যন্ত আর উদ্বোধিত হতে পারে না। তাই এখানে ফ্রানচেস্কা প্লাচানিকার মন্তব্য প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় : "[…] a monodrama with a female protagonist triggers an entirely different set of expectations" (Placanica 2018)। একক চরিত্রভিত্তিক নাটক *কোকিলারা* ভিন্নরকমের প্রত্যাশা জাগালেও, শেষ পর্যন্ত নারী-জীবনের রূপায়ণ পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের পরিসীমায় আটকে থাকে। এই ভাবাদর্শে নারীর শ্রেণি-পরিচয় গৌণ, মুখ্য একমাত্র নারী-পরিচয় এবং সে কারণেই কোকিলাদের মতো নারীরা জয়ী হতে পারে না। সৈয়দ হক – কথিত "বাস্তবের গভীরে বাস্তব" জীবনের রূপকার আবদুল্লাহ আল মামুন – বিরচিত *কোকিলারা* নাটকে নারীজীবনের এই পরাজিত বাস্তবতা রূপায়িত হয়।

১. বিস্তারিত জানতে দেখুন : হেনরিক ইবসেন রচিত *A Doll's House* নাটকের খায়রুল আলম সবুজের বঙ্গানুবাদ *নোরা*, (ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ২০১১)।

তথ্যসূত্র

আজাদ, হুমায়ুন (২০০২)। *নারী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

মজুমদার, রামেন্দু (সম্পা)। (২০০৯)। [সম্পাদকের "মুখবন্ধ"]। *নির্বাচিত নাটক আবদুল্লাহ আল মামুন*। ঢাকা : নালন্দা প্রকাশন।

মামুন, আবদুল্লাহ আল (২০০৯)। *কোকিলারা*। মজুমদার, রামেন্দু (সম্পা), *নির্বাচিত নাটক আবদুল্লাহ আল মামুন*। ঢাকা: নালন্দা প্রকাশন।

হক, সৈয়দ শামসুল। (২০০৮)। "আবদুল্লাহ আল-মামুনকে সহযাত্রীর অভিনন্দন"। থিয়েটারওয়ালা, ১০: ৩-৪, ৩৩।

Ahmed, Syed Jamil. (2014). "Designs of Living in the Contemporary Theatre of Bangladesh". In A. Sengupta, *Mapping South Asia through Contemporary Theatre Essays on the Theatres of India, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Sri Lanka*. Hampshire: Palgrave Macmillan. 135-176.

Moishan, Shahman. (2012). "Manasha: Detecting the loci of an indigenous rite." Depart, 3: 9, 70-74.

Placanica, F. (2018). "The Unsung One: The Performer's Voice in Twentieth-century Musical Monodrama". Journal of Musicological Research, 37: 2, 119-140. DOI: 10.1080/01411896.2017.1381522. Accessed on 14th August 2020.